International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2025; 2(5): 76-79
© 2025 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 04-10-2025
Accepted: 15-10-2025
Publish : 17-10-2025

Malobika Dolui
M.A in Sanskrit,
Burdwan University,
West Bengal, India

Correspondence:
Malobika Dolui
M.A in Sanskrit,
Burdwan University,
West Bengal, India

ঊনিশ শতকের বাংলা নাটকে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রভাব

The influence of Sanskrit literature on 19th-century Bengali drama

Malobika Dolui

সংক্ষিপ্তসারঃ - (Abstract) সংস্কৃত কাব্য প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত। দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য হল দৃষ্টিগ্রাহ্য। কাব্যের রস আস্বাদিত হয় মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে। আর এই অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে অভিনীত বিষয়বস্তুকেই নাটক বা দৃশ্যকাব্য বলে। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য বা নাটক দশপ্রকার রূপক ও আঠারোপ্রকার উপরূপক নিয়ে বিভক্ত। দেবতাগণ ও মহিষীগণদের অনুরোধে প্রজাপতি ব্রহ্মা **'পঞ্চমবেদ'** স্বরূপ নাট্যবেদ রচনা করেন। আমরা জানি বাংলা ভাষার উদ্ভবের আগে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হয়। অতএব, বাংলা নাটকের চর্চা শুরু হয় সংস্কৃত নাটক থেকে। সুতরাং এই কথাই বলতে পারি যে বাংলা নাটকের উপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল। বিশেষত ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা নাটকের কাঠামো, বিষয়বস্তু এবং নাট্যরীতির ওপর কিভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করলাম এই বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে। বাংলা নাটকে সংস্কৃতসাহিত্যে কাব্যিক, চরিত্রায়ণ, বিষয়বস্তু, ভাষারীতিতে প্রভাব ফেলেছিল। সংস্কৃতসাহিত্যের প্রভাব বাংলা নাটকে একটি সর্বজনস্বীকৃত সত্য়। মাইকেল মধুসূদনের লেখা নাটকে গ্রীক এবং সংস্কৃত নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যা পরবর্তী বাংলা নাটকে রচনার মূল ধারা তৈরী করতে সহায়তা করে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বিশেষত রামায়ণ তর্করত্নের লেখা নাটকে প্রমাণ মেলে। যেমন তাঁর লেখা নাটকটি হল অতিবিখ্যাত সমাজচিত্র হিসাবে **"কুলীনকুলসর্বস্ব"**(১৮৫৪)। এই নাটকে পৌরাণিক নাটক হিসাবে **'ধর্মবিজয়'** নাটকটি উল্লেখ করা যায়। আবার এই নাটক থেকেই **'মুদ্রারাক্ষস'** নাটকের আরম্ভ বলা যায়।

সূচক শব্দঃ (Key words) পঞ্চমবেদ, ললিতমাধব, বিদ্যাসুন্দর, উদয়নকথাকোবিদ, কুলীনকুলসর্বস্ব, নির্ব্বাহবিধি।

ভূমিকাঃ ত্রেতাযুগ। অমৃতলোক। দেবতাগণ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবস্থা করতে বলেন। কারণ তখন শূদ্র ও স্ত্রীলোকের বেদপাঠ করবার অধিকার ছিল না।

তাদের অনুরোধে তিনি ঋগ্বেদ থেকে সংলাপ, সামবেদ থেকে সঙ্গীত, যর্জুবেদ থেকে অভিনয় ও অর্থববেদ থেকে রস আহরণ করে **'পঞ্চমবেদ'** স্বরূপ নাট্যবেদ রচনা করেন।—

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যর্জুবেদাদভিনয়ান্ রসানার্থবনাদপি॥[1]

পরে এই নাট্যবেদ/পঞ্চমবেদের শিক্ষার ভার দেন তার প্রিয় শিষ্য ভরতমুনির উপর। ভরতমুনি ছিলেন একজন প্রাচীন ভারতীয় নাট্য ও সঙ্গীত বিশারদ এবং নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা।

আমরা জানি বাংলা ভাষার উদ্ভবের আগে বাঙালীর দ্বারা সংস্কৃত ভাষা ও অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য চর্চার ইতিহাস লিপিবদ্ধ। যদিও বাংলা ভাষা আবিস্কার হওয়ার অনেককাল পর থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটে। বিশেষ করে বাংলা নাটকের চর্চা শুরু হয় সংস্কৃত নাটক থেকে।

চৈতন্য ও চৈতন্য উত্তর যুগের বাংলা নাটকের ওপর সংস্কৃত নাটকের লক্ষণহিসাবে ধরা পড়ে রূপ গোস্বামীর **'ললিতমাধব'** ও **'বিদগ্ধমাধব'** নামে কৃষ্ণলীলা বিষয় দুটি নাটক এবং কবিকর্ণপুরের চৈতন্যলীলা বিষয় **'চৈতন্যচরিতামৃত'** নাটক থেকে তা বোঝা যায়।

সংস্কৃত নাটক বাংলা নাটকের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ ১৮ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা নাটকের কাঠামো, বিষয়বস্তু এবং নাট্যরীতির ওপর সংস্কৃত নাটকের প্রভাব স্পষ্ট ছিল। যেমন— ভারতচন্দ্রের লেখা **'বিদ্যাসুন্দর'** এই নাটকটি সংস্কৃত নাটক থেকে অনুপ্রাণিত এবং এতে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব স্পষ্ট।

ভারতচন্দ্র তাঁর লেখা **'বিদ্যাসুন্দর'** নাটকে সংস্কৃত সাহিত্যে বৌদ্ধ পরম্পরায় এই বিষয়ে একটি লোককাহিনীর সন্ধান মেলে। তা প্রায় ২০০০ বছরের পুরোনোর্ধ, উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী। ভাসের নাটক **'স্বপ্নবাসবদত্তম্'**।

আবার খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতকে রচিত কালিদাসের **'মেঘদূত'** কাব্যে অবন্তী নামে এক গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়; যাঁরা সেখানে থাকেন তাঁরা **'উদয়নকথাকোবিদ্'** বলে খ্যাত।

প্রথমযুগের শ্রেষ্ঠকার রামনারায়ণ তর্করত্ন তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। তখনকার দিনে তৎদৃত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলি ছিল মঞ্চের অভিনয় উপযোগী। অনুবাদ ছাড়া রামায়ণ তর্করত্ন একখানি মৌলিক নাটক রচনা করেন। রামনারায়ণ ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ে পরমপণ্ডিত।

তারমধ্যে অতিবিখ্যাত সমাজচিত্র হিসাবে **'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)** নাটক এবং পৌরাণিক নাটক হিসাবে **'ধর্মবিজয়'** নাটকটি উল্লেখ করা যায়। মৌলিক নাটক রচনাতেও তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত নাট্যরীতিকেই অনুসরণ করেছেন।

"কুলীনকুলসর্বস্ব" নাটকে রয়েছে নান্দী প্রস্তাবনা, কয়েকটি শ্লোক। **'মৃচ্ছকটিক'** নাটকের শকার চরিত্রের অনুরূপ অভব্যচন্দ্রের চরিত্র এবং সংস্কৃত নাটকের ভাব এবং চরিত্র ক্রমে ক্রমে লেখক মানুষে কিভাবে নতুন নতুন মূর্তি ধারণ করেছিল, কিভাবে প্রাচীন ভাব নতুন নতুন ভাব উদ্বোধনে সহায়তা করেছিল রামনারায়ণের এই নাটকতার মধ্যে।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের নান্দী ও প্রস্তাবনা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে। এই নান্দীতে প্রযুক্ত—

"শিশু শশি শোভে ভালে"— ইত্যাদি বাক্যের শিববন্দনা শকুন্তলা নাটকে **'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা'** প্রভৃতি শিব বন্দনাত্মক শ্লোককেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংস্কৃত নাটকের মত নান্দ্যন্তে সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। সূত্রধারের উক্তিতেই নাটকের কথামুখী স্থাপনা হয়। বিধবাবিবাহবিধি বিধির ঘটনা এই কথারই সূত্র ধরে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন।

ঠিক এখান থেকেই কুলপালক মহাশয় নিজের সদ্যুক্তি শুরু করেন— **"বিধবা নির্ব্বাহবিধি বিধির ঘটনা সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সংগত বটে। আমি বন্দ্য ঘটীয় কেশব চক্রবর্ত্তির সন্তান, প্রধান-কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি বিধি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না, তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি।"**[2]

এখান থেকেই মুদ্রারাক্ষস নাটকের আরম্ভ স্মরণ করা যায়। সংস্কৃত নাটকে মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট কবিত্বপূর্ণ প্রকৃতি বর্ণনা থাকে। কারণ সংস্কৃত নাটক দৃশ্যকাব্য।

এইখানে **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'** নাটকের চতুর্থ অংকের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হল। যেমন—

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতি মে।
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয় শোভা॥[3]

রামনারায়ণও সংস্কৃত নাটকের আদর্শে মাঝে মাঝে প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন—

"একি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষন অনবরত পথ পরিশ্রান্ত ও দিনকর কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপ শান্তি নিমিৎ ছায়া প্রদান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ান হইয়া সংবেশসুখ অনুভব করিতেছে। মহীরুহচয় একান্ত পবন-পাত-বিরহে সর্জ্জন মানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। বরাহগণ পললপঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ নিলীন করিয়া রহিয়াছে।"[4]

তবে হাস্যকর সৃষ্টি করতে গিয়ে রামনারায়ণ স্থলবিশেষে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। রামনারায়ণের যে আত্তিকরণের সূচনা মধুসূদন তাঁর বিকাশ রাঢ়বঙ্গের তার অলীক কুনাট্যকে পরিশুদ্ধ করবার অভিপ্রায়ে মধুসূদন নাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।

প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল সংস্কৃত নাট্যরীতির শৃংখল খুন্ন করা। কিন্তু সংস্কৃত বন্ধের প্রতি অবজ্ঞার ভার থাকলেও তিনি সংস্কৃত প্রভাব বর্জন করতে পারেন নি। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অনুকরণে তিনি নাটককে বলেছেন দর্শন কাব্য। (কৃষ্ণকুমারী উৎসর্গ পত্রে এটা রয়েছে)।

বঙ্গীয় নাটকের দুর্দিন দেখে মধুসূদন শ্রদ্ধা ভরে কালিদাস, ভবভূতির নামই স্মরণ করেছেন—

"কোথায় বাল্মীকি ব্যাস,
কোথায় কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"[5]

নাটক প্রণয়ন করতে গিয়েও কালিদাস ভবভূতিকেও অস্বীকার করতে পারেনে নি। মধুসূদনের প্রথম নাটক **'শর্মিষ্ঠা'** নাটক। এই নাটকে নান্দী নেই, সূত্রধার ও নটীর ভূমিকা বর্জিত হয়েছে। কিন্তু নাট্যবৃত্ত রচনায় ঘটনার বিন্যাসে, চরিত্র সৃষ্টিতে, কালিদাস ও অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের প্রমুখ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদার রসিক বিদূষক চরিত্রটি অবিকল সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের প্রতিরূপ।

প্রেম সংঘটনের ব্যাপারেও সংস্কৃত নাটকের কৌশল এক। কালিদাসের প্রভাব তো আছে। উপরোন্তু আছে শ্রীহর্ষের রত্নাবলীর প্রভাব।

রাজন্তপুরের উদ্যানে শর্মিষ্ঠার কাতোরোক্তি— **"তব তোমারি বা দোষ কি"**— এটি যেন সাগরিকার শোকার্তি। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানী যথাক্রমে সাগরিতা ও বাসবদত্তারই প্রতিরূপ।

শর্মিষ্ঠা সাগরিকার মতই মুগ্ধা, সরলা, আর দেবযানী বাসবদত্তার মত কোপনা। শর্মিষ্ঠার সখী দেবীকার ভূমিকাও রত্নাবলীর সখী সুসঙ্গতার অনুরূপ।

শর্মিষ্ঠা নাটকের নায়ক চরিত্র **'যযাতি'** মহাভারতের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। মধুসূদন তাঁর শর্মিষ্ঠায় তার চরিত্র উচ্চ আদর্শ রক্ষা করতে পারেন নি। সাধারণ শৃঙ্গার রসাত্মক নায়কের আদর্শে গড়ে তুলেছেন শুক্রাচার্য্যের চরিত্র।

যে চরিত্র মহাভারতের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নরূপে চিত্রায়িত, আসলে মধুসূদনের প্রতিভা কোনদিনই অনুকরণের প্রতিভা ছিল না। তা সর্বদাই স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াস ছিল।

কিন্তু তাঁর শর্মিষ্ঠা কিংবা অন্যান্য নাটকে তিনি কালিদাসের সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় অনেকক্ষেত্রে অনুবাদ করে দিয়েছেন। কালিদাসের **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'** নাটক থেকে মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকে বাংলায় অনুবাদের কিছু নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। যেমন— **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'** নাটকের প্রথম অংকের একটি শ্লোক থেকে মধুসূদন নিম্ন উদ্ধৃত অংশ অনুবাদ করেছেন।—

'আহা সখে তার কি রূপ মাধুর্য্য, তার পথ নয়ন দর্শন করলে পদ্মের ওপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে অতি সর্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে।'

শকুন্তলা নাটকে চতুর্থ অংকে প্রিয়ংবদার একটি উক্তিকে মধুসূদন এভাবে ভাবানুবাদ করেছেন—

"একদিন আমি এক নদীতটে ভ্রমণ করতে করতে এক পুষ্পাদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে সেই পরম রমনীয়া, নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেন। আপনার করতল কপলে বিন্যাস করে অলোক বৃক্ষতলে বসে রয়েছে। বোধ হল যে সে চিন্তার নবে মগ্না রয়েছে।" মোটের উপরে শর্মিষ্ঠা নাটকের স্বাদ সংস্কৃত প্রণয় দ্বন্দ্বমূলক নাটকের স্বাদ থেকে অভিন্ন।

এই **'শর্মিষ্ঠা'** নাটকে কয়েকটি মাত্র গান আছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় অংকে এই গানটিতে জয়দেবের উক্তিতে—

"উদয় হইল সখী সরস বসন্ত
মোহিত দশদিশ পুষ্পগণে
আর বহিছে সমীর শুশান্ত॥"

দীনবন্ধু মিত্রের লেখা **'নীলদর্পণ'** নাটকে তিনি স্বয়ং এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের সংলাপে সংস্কৃত ভাষার আরোপ সৃষ্টি করে নিজের উপযুক্ত লেখকের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তিনি তাঁর **'নীলদর্পণ'** নাটকটিতে নীলচাষকে কেন্দ্র করে পীড়িত মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছিল। তিনি যেহেতু ঐ সময়ের ইংরেজ শাসনাধীনের আওয়াতার মধ্যে সরকারী চাকরী করতেন, তাই তিনি নিজের নাম ব্যবহার না করে এই নীলদর্পণ নাটকের নামের পরিবর্তে **"কস্যচিৎ পথিকস্য"—** এইরূপ বাক্য সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োগ করেছেন। তিনি তাঁর নাটকে একটি স্থানে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব ফেলেছেন—

যেমন— **"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"**[6]

সুকুমার সেন বলেছেন দ্বিজতনয়া নামে এক জনৈকা নাট্যকার **'ঊষা নাটক'**(১৮৭১), **'ঊর্বশী নাটক'**(১৮৬৬) এবং **'রামের বনবাস নাটক'**(১৮৭৭) রামায়ণ অবলম্বনে এই পৌরাণিক নাটকগুলি রচনা করেছিলেন, যেখানে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

গিরিশচন্দ্রের সময়কালে মঞ্চের প্রয়োজনে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় রামায়ণ ও মহাভারত এই সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বনে বেশ কিছু বাংলা পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন। যেমন— **'দ্রৌপদী স্বয়ম্বর'** (১৮৮৪), **'রাবণবধ'** (১৮৮২), **'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ'**(১৮৮৯), **'প্রভাস মিলন'** (১৮৮৭) প্রভৃতি। ভক্তিরসের উৎস লক্ষ্য করা যায় বিহারীলালের পৌরাণিক নাটকগুলিতে।

এই বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি থেকে বোঝা যায় যে, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব আছে অপরিসীম। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তিনি সংস্কৃত সাহিত্য তথা রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে অনেক বাংলা পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন। অতএব, তাঁর লেখা পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা হল অসংখ্য। তাঁর লেখা প্রথম পৌরাণিক নাটক যা সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত রামায়ণকে অনুসরণ করে রচিত হয়েছিল। সেই প্রথম পৌরাণিক নাটক হল— **'রাবণবধ'**। এই নাটকটি রচনা করে তিনি অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

এই **'রাবণবধ'** নাটকটি লিখে তিনি উৎসাহিত হয়ে আর একটি পৌরাণিক নাটক রচনা করলেন। সেই নাটকটি হল— **'সীতার বনবাস'**। বাঙালি মহিলারাও সেদিন বনবাসিনী সীতার অশ্রুজলের ধারায় ভেসে গিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটকগুলি হল— **'সীতার বিবাহ'**, **'লক্ষণবর্জন'**, **'রামের বনবাস'**, **'পাণ্ডবগৌরব'**, **'সীতাহরণ'**, **'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'**, **'তপোবন'** ইত্যাদি।

উনিশ শতকের বাঙালিরা সেদিন গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ভক্তিরসের প্লাবনে ভেসে গিয়েছিল। তিনি তাঁর রচিত বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতে এত গভীরভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব ফেলেছিলেন যে তা থেকে বোঝা যায় যে উনিশ শতকের বাংলা নাটকে সংস্কৃত সাহিত্য ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে তিনি আরও বাংলা পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন। সেই নাটকগুলি হল— **'ভীমের শরশয্যা'**, **'যদুবংশ ধ্বংস'**, **'হরধনুভঙ্গ'**, **'নরমেধযজ্ঞ'**, **'প্রহ্লাদচরিত্র'**, **' রামের বনবাস'**, প্রভৃতি।

অমৃতলালের লেখা সংস্কৃত সাহিত্য তথা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে দুটি বাংলা পৌরাণিক নাটক ছিল। এগুলি হল— **'হরিশ্চন্দ্র'** (১৮৯১) এবং **'যাজ্ঞসেনী'** (১৯২৮)। ক্ষেমীশ্বরের লেখা **'চণ্ডকৌশিক'** নাটক অবলম্বনে এই **'হরিশ্চন্দ্র'** নাটকটি রচিত হয়েছিল। অমৃতলাল বসুর সার্থক পৌরাণিক নাটকটি হল—**'যাজ্ঞসেনী'**। এই **'যাজ্ঞসেনী'** নামক বাংলা পৌরাণিক নাটকটি মহাভারতের কৌরব ও পাণ্ডবদের বিবাদ কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। এইখানে এই স্থলেও বোঝা যায় যে, বাংলা নাটকের উপর কিভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সময়কালীন আরও অনেক অপ্রধান নাট্যকার যাঁরা পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করে বাংলা নাটক রচনা করেছিলেন। যেমন— কালিদাস সান্যালের লেখা **'নলদময়ন্তি'**, নিমাই চাঁদ শীল-এর লেখা **'ধ্রুব চরিত্র'**, দুর্গাদাস করের লেখা বাংলা পৌরাণিক নাটক হল— **'স্বর্ণকমল'**, মহেশচন্দ্র দাসগুপ্তের লেখা **'অভিমন্যুবধ'**, নন্দলাল রায়ের **'অর্জুনবধ'**, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা **'জয়দ্রথবধ'** প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বা বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব থাকায় এই বাংলা নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ছিল প্রবল। উনিশ শতকের বাংলা নাটকে অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত পুরাণের প্রভাবও জোড়ালোভাবে পরেছে। এর কারণ হল বাঙালীর সহজাত আকর্ষণ ছিল পুরাণের প্রতি। পুরাণের নানা কাহিনী পরম্পরায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম। যেমন— আমোদে-প্রমোদে, চণ্ডীমণ্ডপের গল্পে, ছড়ায়, যাত্রায়, গানে প্রভৃতি।

আজও আমরা পাপপূণ্যের প্রশ্নে পুরাণের কাছে শরণ নিই। **'রাম-সীতা'**, **'সাবিত্রী-সত্যবান'**, **'হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী'** অতিপরিচিত আমাদের কাছে। কিন্তু জটিল পথে চলতে চলতে বাস্তব দ্বন্দ্ব 'গোটা মানুষের মনে' খুঁজতে হয় সমকালের দিকে তাকিয়ে। উনিশ শতকের এই বাংলা নাটকের ওপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব ছিল ব্যাপক। বিশেষ করে ধ্রুপদী নাটকের ঐতিহ্য, পৌরাণিক এবং চরিত্র, কাহিনী রচনার মাধ্যমে। এই পৌরাণিক নাটকগুলি ঐ সময় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল সমাজের প্রতি।

নতুন মাত্রা যোগ করে বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাটকের সংলাপের ব্যবহারে। বাংলা নাটকের ওপর সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলা নাটকের ওপর সংস্কৃত সাহিত্যের গভীর প্রভাব যা সমাজের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। উনিশ শতকের বাংলা নাটকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল, যা নাটকের চরিত্র-চিত্রণ, নাটকের গঠন এবং বিষয়বস্তুর ওপর স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত।

বাংলা নাটকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব উনিশ শতকের বাংলা নাটকের বিকাশে নতুন দিক উন্মোচন করেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির মিশ্রণে এক নতুন ধারা তৈরী হয়েছিল বাংলা নাটকে।

উপসংহারে শুক্রাচার্য্যের সেই আশীর্বানী—

"হে রাজন এখন আশীর্বাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরম সুখে কালযাপন কর।"[7]

এটি সংস্কৃত নাটকের যেন ভরত বাক্যের মত।

এইভাবেই আমরা দেখি যে আধুনিক বাংলা নাটকে উনিশ শতকের যে নাটক রয়েছে তাতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল প্রভাব পড়েছে এবং এই প্রভাবকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। সংস্কৃত নাটকের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার হয়েছিল তা উনিশ শতকের সৃষ্টি হওয়া বাংলা নাটকের নাটকীয়তা থেকে তা বোঝা যায়। বাংলা নাটকে এক নতুন রূপান্তর আসে পশ্চিমা সাহিত্যের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন ঘটিয়ে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে। বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু, ভাষা এবং শৈলীতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। এইভাবে বাংলা নাটকে বিশেষ করে চরিত্রের ধর্মীয় দিকটিকে সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক উপাদান আলোম্বিত করে তুলেছে। একটি নতুন সাহিত্যিক ধারা তৈরী করতে সাহায্য করে এই

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবটি। উনিশ শতকের বাংলা নাটকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব একটি আধুনিকীকরণ মাত্রা এনে দিয়েছিল।

সহায়কগ্রন্থসূচী

১। তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ, "কুলীনকুলসর্বস্ব", চতুর্থবার মুদ্রিত, কলিকাতা, সম্বৎ— ১৯২৭।

২। শর্ম্ম, শ্রীরামনারায়ণ, "কুলীনকুলসর্বস্ব", কলিকাতা, সম্বৎ— ১৯১১/৫৭।

৩। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, "শর্মিষ্ঠা", শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবন, কলিকাতা, সম্বৎ— ১২৭০।

৪। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, "শর্মিষ্ঠা", বন্দ্যোপাধয়ায়, বজ্রেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১ আর্চায প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬।

৫। শর্ম্ম তর্করত্ন, শ্রীরামময়, "মৃচ্ছকটিক", বঙ্গ ভাষায় অনুপাদিত ও পরিশোধিত, কলিকাতা, সম্বৎ—১৯৩১।

৬। রায়, বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার, "অভিজ্ঞানশকুন্তলা", কলিকাতা, কসাইটোলা নং ৬০। ১২৬২।

৭। ঘোষ, অজিত কুমার, "বাংলা নাটকের ইতিহাস"।

৮। সেন, সুকুমার, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"।

৯। "গিরিশ রচনাবলী" (১)- সাহিত্য সংসদ।

তথ্যসূত্র:

[1] নাট্যশাস্ত্রম্-১/১৭।

[2] 'কুলীনকুলসর্বস্ব', পৃষ্ঠা-৭।

[3] 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' -৪/৩।

[4] 'কুলীনকুলসর্বস্ব', পৃষ্ঠা-১০।

[5] 'শর্মিষ্ঠা' প্রস্তাবনা।

[6] 'নীলদর্পণ', তৃতীয় অংক, প্রথম গর্ভাঙ্ক, পৃষ্ঠা-৫২।

[7] 'শর্মিষ্ঠা', পৃষ্ঠা-৮৪।